BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010020
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়াস : সমস্যা ও সম্ভাবনা

Snehasish Das

D.El.Ed (2021-23), Debra Institute of Education and Technology, Duan
Email: das.snehasish91@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা দেশের মানবসম্পদ বিকাশের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে—যেমন অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (1987), সর্ব শিক্ষা অভিযান (2001), শিক্ষার অধিকার আইন (2009), সমগ্র শিক্ষা অভিযান (2018) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (2020)। এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এখনও অসমান, বিশেষত গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে। অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক সংকট, প্রশিক্ষণের অভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা শিক্ষার অগ্রগতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। তবে তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং সমাজ-অভিভাবক অংশগ্রহণ শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। সুতরাং, নীতি বাস্তবায়নের দক্ষতা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক পরিকল্পনা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করে তুলতে সক্ষম হবে।

মূল শব্দ: *প্রাথমিক শিক্ষা, মানোন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০।*

ভূমিকা:

শিক্ষা হল মানব সভ্যতার সর্বাধিক শক্তিশালী ভিত্তি, যার ওপর নির্ভর করে সমাজের জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং জাতীয় চেতনার সংহতি। এক অর্থে শিক্ষা কেবল তথ্য বা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া নয়, এটি মানব মনের বিকাশ, চিন্তাশক্তির পরিপক্বতা, এবং সমাজে ন্যায়, সমতা ও সহযোগিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি মৌলিক উপায়। এই কারণেই বলা হয় — "শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে তোলে।"

একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের পরিমাপ নির্ভর করে তার নাগরিকদের শিক্ষার মানের ওপর। যে রাষ্ট্রের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় ও মানসম্পন্ন, সে রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজ সাধারণত সচেতন, নৈতিক, উৎপাদনশীল ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সেই শিক্ষার প্রথম ধাপ, যেখানে শিশুর মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি গঠিত হয়। এই স্তরেই গড়ে ওঠে ভাষাগত দক্ষতা, গণনাশক্তি, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বোধ।

ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র সাক্ষরতার সূচনা নয়; এটি জাতীয় ঐক্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের অন্যতম ক্ষেত্র। ভারত একটি বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক ও বৈচিত্র্যময় সমাজ, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা হলো এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করা। বিদ্যালয় শিশুদের প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা সমাজের নিয়ম, মূল্যবোধ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন মানে কেবল পাঠ্যজ্ঞান অর্জন নয়, বরং ভবিষ্যৎ নাগরিককে জাতির নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত সরকার "সকলের জন্য শিক্ষা" (Education for All) এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্র ১৪ বছরের নিচের সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এই আদর্শকে বাস্তবায়নের পথে দেশ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে—যেমন অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (1987), সর্ব শিক্ষা অভিযান (2001), শিক্ষার অধিকার আইন (2009), এবং সাম্প্রতিক সমগ্র শিক্ষা অভিযান (2018)।

২০০২ সালে সংবিধানের ৮৬ নং সংশোধনীর মাধ্যমে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয় (আর্টিকেল ২১-এ)। এর ফলে ভারতবর্ষে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেশের শিক্ষা ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।

তবে বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে এই মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে এখনও বহু বাধা ও সীমাবদ্ধতা বিরাজমান। দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষক সংকট, প্রশিক্ষণের অভাব, এবং পাঠ্যক্রমের অসামঞ্জস্যতা প্রাথমিক শিক্ষার মানকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তার মানোন্নয়ন সমানতালে হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার মূলভিত্তি আধুনিক যুগে গঠিত হলেও এর শিকড় নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের গভীরে। ভারতবর্ষের শিক্ষাচর্চার ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন যুগে শিক্ষা ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা নৈতিকতা, ধর্ম, দর্শন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল।

বৈদিক যুগে শিক্ষা মূলত গুরুকুল প্রথার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। গুরুর আশ্রমে শিক্ষার্থী আবাসিকভাবে থেকে শিক্ষালাভ করত এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানবিক গুণাবলি, শৃঙ্খলা, আত্মসংযম ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। শিক্ষার পরিধি ছিল নৈতিক শিক্ষা, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কৃষি, সংগীত ও দর্শন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রথা সমাজে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে, যদিও তা মূলত উচ্চবর্ণ ও বিশেষ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা আরও গণমুখী হয়ে ওঠে। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা, উদন্তপুরী প্রভৃতি বিখ্যাত মহাবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে দেশি-বিদেশি ছাত্ররা শিক্ষা অর্জন করত। এসময়ে প্রাথমিক শিক্ষা মূলত মৌখিক ও চরিত্রগঠনমূলক ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল জীবনের নৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতি।

মধ্যযুগে ইসলাম আগমনের পর ভারতে শিক্ষার নতুন ধারার সূচনা হয়। মুসলিম শাসকরা মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, যা ধর্মীয় ও প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। এই শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি, ফারসি, ধর্মীয় জ্ঞান, অঙ্ক ও সাহিত্য পড়ানো হতো। অন্যদিকে, হিন্দু সমাজে টোল ও পাঠশালা ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল, যেখানে সংস্কৃত, গণিত, নীতিশাস্ত্র ও দর্শনের পাঠ দেওয়া হতো। এই সময়ে শিক্ষা যদিও নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল, তবু এটি ভারতীয় সমাজের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

ভারতের আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত রূপ গঠিত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ব্রিটিশ শাসকেরা প্রথমে শিক্ষাকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিল—তাদের লক্ষ্য ছিল এমন এক শ্রেণি তৈরি করা যারা "রক্তে ভারতীয় কিন্তু চিন্তায় ইংরেজ।" তবুও তাদের উদ্যোগে ভারতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো তৈরি হয়, যা পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট ছিল এই পরিবর্তনের সূচনা। এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ভারতের শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে, যদিও তা মূলত উচ্চশিক্ষা ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়।

এরপর আসে ১৮৩৫ সালের লর্ড ম্যাকলে-র "মিনিট অন এডুকেশন", যেখানে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়। এটি ভারতীয় শিক্ষার চরিত্রে গভীর প্রভাব ফেলে, এবং ইংরেজি ভাষাভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালের উডস ডেসপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার "ম্যাগনা কার্টা" হিসেবে বিবেচিত। এতে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারি দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই নথিতে বলা হয়, শিক্ষা রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব, এবং প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অনেকাংশে জেলা ও পৌর প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হয়, যা ভারতীয় শিক্ষার স্থানীয়ীকরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত সরকার শিক্ষাকে জাতীয় পুনর্গঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে। রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯) উচ্চশিক্ষা নিয়ে কাজ করলেও প্রাথমিক স্তরে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি গঠনের ওপর গুরুত্ব দেয়। এরপর মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩) শিক্ষার কাঠামোকে আরও সুসংগঠিত করতে ৮-৬-৩ প্যাটার্নের প্রস্তাব দেয়, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি পৃথক স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬), যা "শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার" এই ধারণা সামনে আনে। কমিশন সুপারিশ করে যে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, বিনামূল্যে এবং মানসম্মত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে "কমন স্কুল সিস্টেম"-এর ধারণা প্রস্তাব করে, যাতে সমাজের সব শ্রেণির শিশু একই মানের শিক্ষা পায়।

এরপর ১৯৮৬ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE) শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে বলা হয়, "Education for All" ভারতীয় রাষ্ট্রের মৌলিক অঙ্গ। ১৯৯২ সালে সংশোধিত সংস্করণে বিশেষ জোর দেওয়া হয় নারীশিক্ষা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে ২১শ শতকের প্রথম দশকে ভারত সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করে—অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (১৯৮৭), ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রজেক্ট (DPEP, ১৯৯৪), সর্ব শিক্ষা অভিযান (SSA, ২০০১) এবং পরবর্তীতে সমগ্র শিক্ষা অভিযান (২০১৮)। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও শিশু-বান্ধব পাঠ্যক্রম তৈরি করা।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র:

ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং জটিল শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকারী। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ ও সর্বজনীনীকরণের লক্ষ্যে দেশ নানা দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এর ফলস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আজ অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সরকার পরিচালিত কর্মসূচিগুলি শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

সর্ব শিক্ষা অভিযান (Sarva Shiksha Abhiyan - SSA), শিক্ষার অধিকার আইন (Right to Education Act - RTE, 2009), এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযান (Samagra Shiksha Abhiyan) প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এই কর্মসূচিগুলির ফলে ভর্তি হার (Gross Enrollment Ratio) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্কুলে উপস্থিতির হারও তুলনামূলকভাবে উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েশিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে সংখ্যাগত অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের প্রশ্নটি আজও একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। ASER (Annual Status of Education Report)-এর প্রতিবেদনগুলি ধারাবাহিকভাবে ইঙ্গিত করে যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণমান কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছায়নি। বহু শিক্ষার্থী তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে পৌঁছেও প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই সঠিকভাবে পড়তে সক্ষম নয়; অনেকেই মৌলিক গণিতের যোগ-বিয়োগ বা গুণ করতে পারে না। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার *আসলে শেখার মান* (learning outcome) উন্নত হচ্ছে না।

এই সংকটের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অনুপস্থিতির হার এখনও গড়ে ২০% বা তারও বেশি, যা শ্রেণিকক্ষের কার্যকর শিক্ষাদান ব্যাহত করে। দ্বিতীয়ত, বহু বিদ্যালয়ে এখনও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সংযোগের অভাব বিদ্যমান। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সমস্যা তীব্র। তৃতীয়ত, শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষার মানে তীব্র বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়; শহুরে অঞ্চলে শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে উন্নত হলেও গ্রামীণ এলাকায় তা অত্যন্ত নিম্নমানের।

এছাড়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি, পাঠ্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতার অভাব, এবং শিশু-বান্ধব শিক্ষণপদ্ধতির সীমিত প্রয়োগও শিক্ষার গুণগত মান হ্রাসের অন্যতম কারণ। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এখনও "রট লার্নিং" বা মুখস্থনির্ভর শিক্ষাদান প্রাধান্য পায়, যার ফলে শিশুদের সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশক্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

একইসঙ্গে, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, শিশুশ্রম এবং অভিভাবকদের নিম্ন শিক্ষাগত সচেতনতা অনেক শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাতায়াত থেকে বিরত রাখে। শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হলেও তার বাস্তবায়ন ক্ষেত্রভেদে অসমান রয়ে গেছে।

অন্যদিকে, কিছু ইতিবাচক দিকও লক্ষ করা যায়। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট ক্লাস, এবং জাতীয় শিক্ষা মিশনগুলির সম্প্রসারণ শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করছে। সরকার "নিপুণ ভারত অভিযান"-এর (NIPUN Bharat Mission, ২০২১) মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে প্রতিটি শিশুর মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনাক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করেছে, যা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

তবে, এই প্রচেষ্টা সফল করতে হলে প্রয়োজন নীতি বাস্তবায়নের দৃঢ়তা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন, এবং অভিভাবক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। কেবল সংখ্যাগত সাফল্যে নয়, শিক্ষার প্রকৃত গুণগত বিকাশে জোর দেওয়াই হবে ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের সরকারি উদ্যোগসমূহ:

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এগুলির উদ্দেশ্য কেবল বিদ্যালয়ে ভর্তি হার বৃদ্ধি নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা।

অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (Operation Blackboard, 1987): ১৯৮৭ সালে চালু হওয়া এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মৌলিক অবকাঠামো এবং শিক্ষণ-শিক্ষণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা। এর অধীনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ-ডেস্ক, শিক্ষাসামগ্রী এবং দুটি প্রশিক্ষিত শিক্ষক সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই একটি উপযুক্ত শিক্ষণ পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে পারে। যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, তবুও এটি ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

সর্ব শিক্ষা অভিযান (Sarva Shiksha Abhiyan - SSA, 2001): ২০০১ সালে শুরু হওয়া সর্ব শিক্ষা অভিযান ছিল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর লক্ষ্য ছিল ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই কর্মসূচি বিদ্যালয় নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ, এবং মেয়েদের ও বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেয়। SSA-এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি বিদ্যালয়ভর্তি হারেরও উন্নতি ঘটে। এছাড়া, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নানা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার অধিকার আইন (Right to Education - RTE, 2009): ২০০৯ সালে কার্যকর হওয়া শিক্ষার অধিকার আইন ভারতীয় শিশুদের জন্য শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। এই আইনের মাধ্যমে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, অবকাঠামো, ও শিক্ষার মানের নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতেও ২৫% আসন আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এই আইন শিক্ষার সমতা ও অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (Samagra Shiksha Abhiyan, 2018): ২০১৮ সালে চালু হওয়া "সমগ্র শিক্ষা অভিযান" প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার উন্নয়নকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত রূপ প্রদান করেছে। এটি "Education in Continuum" ধারণার উপর ভিত্তি করে, যেখানে শিশুদের সার্বিক বিকাশ—শিক্ষা, দক্ষতা, মানসিক স্বাস্থ্য ও মূল্যবোধের বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ, ডিজিটাল কন্টেন্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক গুণগত মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy, NEP 2020): ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। এই নীতিতে "৫+৩+৩+৪" কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে, যেখানে ৩ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। "Foundational Literacy and Numeracy" বা প্রাথমিক ভাষা ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জনকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই নীতির মূল দর্শন হলো "Education for All, and Quality Education for Each Child"। প্রাথমিক স্তরে স্থানীয় ভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষক প্রশিক্ষণের আধুনিকীকরণ, এবং প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি এই নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই সকল উদ্যোগের সম্মিলিত প্রয়াসে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ক্রমাগত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তবে গুণগত মান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোগত সমতা অর্জন এখনও এক চলমান চ্যালেঞ্জ। তবুও এই নীতিমালা ও কর্মসূচিগুলি প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ গঠনে এক সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের পথে প্রধান সমস্যা:

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক নীতি, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয় সংখ্যা, ভর্তি হার এবং সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান এখনো সন্তোষজনক নয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের পথে কিছু মৌলিক প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে, যা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। নিচে সেই প্রধান সমস্যাগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হলো—

অবকাঠামোগত ঘাটতি: প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্যতম বড় অন্তরায় হলো বিদ্যালয়গুলির অবকাঠামোগত দুর্বলতা। ভারতের বহু সরকারি বিদ্যালয়ে এখনও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, বেঞ্চ-ডেস্ক, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠাগার, এবং বিজ্ঞান বা কম্পিউটার ল্যাবের অভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক বিদ্যালয়ে শৌচালয় বা নিরাপদ পানীয় জলের মতো মৌলিক সুবিধাও অনুপস্থিত। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ঘাটতি আরও প্রকট। ASER (Annual Status of Education Report) অনুসারে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা কেবল শারীরিক সুবিধার অভাব নয়, বরং শিক্ষার মান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এবং শেখার আগ্রহের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

শিক্ষক সংকট ও প্রশিক্ষণের অভাব: একজন শিক্ষক শিক্ষার মান নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ঘাটতি একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারিত মানের তুলনায় কম, ফলে একাধিক শ্রেণির পাঠদান এক শিক্ষককেই সামলাতে হয়। তাছাড়া, অনেক শিক্ষক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বা আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত নন। এর ফলে পাঠদান একঘেয়ে হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীরা শেখার প্রতি আগ্রহ হারায়। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, ট্রান্সফার সমস্যা, এবং পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাবও মানসম্পন্ন শিক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা: প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনেক সময় স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এখনও মুখস্থ নির্ভর পদ্ধতি প্রচলিত, যা সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশে ব্যর্থ। কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এবং NEP 2020 উভয়ই শিশুকেন্দ্রিক, কার্যভিত্তিক ও ক্রমাগত মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর জোর দিলেও বাস্তবে তা সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার মানের প্রকৃত উন্নতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য: ভারতের সমাজে দারিদ্র্য, জাতিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য এবং অঞ্চলগত অসাম্য শিক্ষার সমান সুযোগকে ব্যাহত করে। অনেক দরিদ্র পরিবারে শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত করা হয়, যার ফলে তারা বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারে না। মেয়েশিশুরা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় প্রায়ই প্রাথমিক শিক্ষার পর পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হয়, বিয়ে বা গৃহস্থালির কাজে লিপ্ত হয়। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিদ্যালয়ে বঞ্চিত হয়। এসব সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য শিক্ষার সর্বজনীনীকরণের পথে একটি মৌলিক অন্তরায়।

প্রযুক্তিগত বৈষম্য: ২১শ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে, কিন্তু ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ডিজিটাল বিভাজন অত্যন্ত তীব্র। শহুরে বিদ্যালয়গুলোতে স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল বোর্ড, ইন্টারনেট সংযোগ ও অনলাইন শিক্ষার সুযোগ থাকলেও, গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলো এখনো এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। COVID-19 মহামারির সময় অনলাইন শিক্ষার প্রয়োগে এই বৈষম্য আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—অনেক শিক্ষার্থী স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট না থাকায় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাবও ডিজিটাল শিক্ষাকে সীমিত করে রেখেছে।

মানোন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ:

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে, যেখানে সঠিক পরিকল্পনা, নীতি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি গুণগত শিক্ষাবিপ্লব ঘটানো সম্ভব। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সাফল্য অর্জন করলেও এখন মূল চ্যালেঞ্জ হলো *শিক্ষার মানোন্নয়ন*। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রতিটি উপাদানকে সমন্বিতভাবে শক্তিশালী করা—শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, প্রযুক্তি, সমাজ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি। নিচে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বিশদভাবে আলোচনা করা হলো—

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন: শিক্ষক হলেন শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। একটি কার্যকরী শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে হলে প্রথমে শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের নিয়মিত *pre-service* ও *in-service* প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। শুধু প্রশিক্ষণ নয়, তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, প্রতিক্রিয়া এবং প্রণোদনা (incentive) প্রদানও প্রয়োজন। DIET (District Institute of Education and Training) কেন্দ্রগুলোকে আরও আধুনিক ও ফলপ্রসূ করে তোলা আবশ্যক, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও বাস্তবমুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের ডিজিটাল টুল ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা, শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং *peer learning* ও *mentorship program* চালু করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা: ২১শ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। ভারতে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রসার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করা গেলে শিক্ষার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে। সরকার ইতিমধ্যেই DIKSHA, SWAYAM, eVidya, PM ePathshala ইত্যাদি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য ই-লার্নিং সামগ্রী সরবরাহ করে। এই উদ্যোগগুলিকে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে প্রযুক্তি শহর ও গ্রামের মধ্যে বিভাজন না সৃষ্টি করে বরং শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। এছাড়া, বিদ্যালয়ভিত্তিক *smart classroom*, ইন্টারনেট সংযোগ, এবং ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয়, অংশগ্রহণমূলক ও শিশুকেন্দ্রিক করা সম্ভব।

স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শিশুর বোঝার ক্ষমতা ও শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশু তার নিজস্ব ভাষায় শেখার সুযোগ পেলে তার জ্ঞানার্জন ও প্রকাশ ক্ষমতা বহুগুণে বাড়ে। ভারতের বহুভাষিক সমাজে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, লোকজ জ্ঞান, ও ঐতিহ্যকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষা আরও জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠবে। এতে শিক্ষার্থী নিজের সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে এবং আত্মপরিচয়ের বোধ গড়ে উঠবে। অতএব, পাঠ্যবই, শিক্ষাসামগ্রী ও উদাহরণে স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত করা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে।

সমাজ ও অভিভাবকের অংশগ্রহণ: প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বিদ্যালয়কে যদি সমাজের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে শিক্ষার মানোন্নয়ন একটি সম্মিলিত সামাজিক দায়িত্বে পরিণত হবে।

School Management Committee (SMC), Village Education Committee (VEC) এবং Parent-Teacher Association (PTA)-এর মতো সংস্থাগুলি বিদ্যালয় পরিচালনা, তদারকি এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, যাতে শিশুর নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ে। সমাজভিত্তিক উদ্যোগ—যেমন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, NGO, ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা—বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE): প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল তথ্য মুখস্থ করা নয়, বরং শিশুর মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটানো। এই কারণে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। "ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন" (CCE) ব্যবস্থা শিশুর প্রতিদিনের শেখার প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়। এটি পরীক্ষাভিত্তিক নয়, বরং পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণ, সৃজনশীলতা ও আচরণগত উন্নতির ওপর ভিত্তি করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতার চাপে না ফেলে শেখার আনন্দ দেয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। শিক্ষক ও বিদ্যালয়কে এই নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগে দক্ষ করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিশুর বিকাশ সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়।

উপসংহার:

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা বহুস্তরীয় ও ধারাবাহিক। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার—এই তিনটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া শিক্ষার মানের উন্নতি সম্ভব নয়।যদিও অবকাঠামোগত ঘাটতি, শিক্ষক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতা এখনও রয়ে গেছে, তথাপি **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০**-এর প্রণয়ন এক নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন, এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। শেষমেশ বলা যায়, "মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা" কেবল শিশুদের জ্ঞান অর্জনের পথ নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার এক অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম।

তথ্যসূত্র:

1. সরকার, অরুণচন্দ্র। (২০15)। *ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা: অতীত ও বর্তমান।* কলকাতা: দে'স পাবলিশিং।
2. মুখার্জি, সত্যব্রত। (২০17)। *ভারতের শিক্ষানীতি ও প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার।* কলকাতা: প্রগতি প্রকাশনী।
3. চক্রবর্তী, সুজাতা। (২০১9)। *গ্রামীণ শিক্ষার মানোন্নয়নের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা।* শিক্ষা ও সমাজ, ১২(২), ৪৫–৬০।
4. ভট্টাচার্য, অরিন্দম। (২০২০)। *শিক্ষার অধিকার আইন ও তার বাস্তব প্রয়োগ: একটি বিশ্লেষণ।* আধুনিক শিক্ষা, ৮(১), ৩১–৪৮।
5. মজুমদার, কৌশিক। (২০২১)। *সর্ব শিক্ষা অভিযান থেকে সমগ্র শিক্ষা অভিযান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা।* ভারতীয় শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা, ৯(৩), ৬৫–৮২।
6. দত্ত, ইন্দ্রনীল। (২০১৮)। *প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা ও সমস্যা।* শিক্ষার আলো, ৫(১), ৫৫–৭০।
7. চট্টোপাধ্যায়, রত্না। (২০২২)। *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও প্রাথমিক শিক্ষার রূপান্তর।* শিক্ষাচিন্তা, ১০(৪), ৮৯–১০৩।
8. ঘোষ, অমরেন্দ্র। (২০১৬)। *অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন।* বাংলা শিক্ষা, ৪(২), ২৪–৩৮।
9. রায়, মধুমিতা। (২০২৩)। *ডিজিটাল শিক্ষা ও প্রাথমিক স্তরে প্রযুক্তির প্রয়োগ: ভারতীয় প্রেক্ষাপট।* তথ্য ও শিক্ষা, ৭(১), ৪১–৬২।
10. পাল, বিপ্লব। (২০২০)। *সমাজ ও প্রাথমিক শিক্ষার আন্তঃসম্পর্ক: এক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।* সমাজ ও উন্নয়ন, ১৫(২), ১০২–১১৮।

Citation: Das. S., (2025) "ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়াস : সমস্যা ও সম্ভাবনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.